উৎপাদনশীলতা এবং লাভক্ষতির হিসাব:

বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে ধান-মাছ-উদ্যানপালন ভিত্তিক চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১৪-১৫ টন খাদ্যশস্য ও সবজি, ১ টন মাছ ও চিংড়ি, ০.৫-০.৮ টন মাংস, ১০-১২ হাজার ডিম, ৩-৫ টন প্রাণী খাদ্য ছাড়াও প্রচুর ফুল পাওয়া যায়। অষ্টম বছর থেকে ১৫-১৭ টন খাদ্যশস্য ও সবজি সহ ফলের গাছ ও কৃষিবন থেকে ১০-১২ টন তন্তু বা জ্বালানিকাঠও মেলে। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রথম বছরে হেক্টরে প্রায় দেড়লাখ টাকা এবং পঞ্চম বছর থেকে দুই লাখ বা তারও বেশী আয় হতে পারে।

সুবিধা:

জল জমে থাকে এমন গভীর চিরাচরিত পদ্ধতিতে ধানচাষের তুলনায় নীচুজমিতে আলোচিত পদ্ধতিতে চাষ করলে জমিতে ১৫-১৭ গুণ ফলনক্ষমতা বাড়ে। প্রকৃত আয়ও ২০ গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এছাড়া বছরে হেক্টরপিছু বাড়তি ৩০০ টি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব। ধানের সাথে মাছ চাষে অন্যান্য সুবিধাও আছে। এখানে ক্ষুদ্র জলবিভাজিকা থাকার জন্য খরার সময়ে ফসলে জীবনদায়ী সেচ ও জমি থেকে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা যায়। এছাড়া ধান, মাছ, হাঁসসহ অন্যান্য উপাদানের সদর্থক প্রভাবিত মাটিতে উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ বাড়ে এবং জৈব পদ্ধতিতেই রোগ-পোকা ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্ভাবনা:

পশ্চিম বঙ্গের কিছু এলাকায় ধান-মাছ-উদ্যানপালন ভিত্তিক বহুস্তরীয় চাষপদ্ধতি অনুযায়ী কৃষিকাজ চালু হয়েছে। রাজ্যের কৃষকবন্ধুরা এই প্রযুক্তিতে চাষ করতে চাইলে নাবার্ডের মাধ্যমে সহায়তা পেতে পারে।

গভীর নীচুজমির জন্য ধান-মাছ-উদ্যানপালন ভিত্তিক বহুস্তরীয় চাষপদ্ধতি

রাষ্ট্রীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের প্রযুক্তিপত্র সংখ্যা-১৫৫

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, রাষ্ট্রীয় ধান্য গবেষণা সংস্থা

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক, জানুয়ারী, ২০২১

ভাষান্তর: পার্থসারথি রায়, সহ-কৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু), বহরমপুর মহকুমা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদনা এবং বিন্যাস: সঞ্জয় সাহা এবং সন্ধ্যারাণী দলাল

চিত্রগ্রহণ: অ্যানি পুনম এবং ভগবান বেহেরা

টাইপ সেট - ভাকৃঅনুপ - রাষ্ট্রীয় চাউল গবেষণা সংস্থান, কটক (উড়িষ্যা) ৭৫৩০০৬

প্রকাশক - নির্দেশক, রাষ্ট্রীয় চাউল গবেষণা সংস্থান, কটক

মুদ্রণ - প্রিণ্টটেক্ আফসেট্ প্রা.লিঃ., ভুবনেশ্বর

গভীর নীচুজমির জন্য ধান-মাছ-উদ্যানপালন ভিত্তিক বহুস্তরীয় মিশ্র চাষপদ্ধতি

অ্যানি পুনম, সঞ্জয় সাহা, বিশ্বজিৎ মন্ডল, দেবারতী ভাদুরী, প্রদীপ কুমার সাহু এবং ডি. পি. সিনহাবাবু

ভারতে ৪.৩ কোটি হেক্টর এলাকায় ধানচাষ হয়। এর মধ্যে ৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকা নীচু জমি। শুধু পূর্বভারতেই ৩০ লক্ষ হেক্টর জায়গায় নীচু জমিতে ধানচাষ হয়। এই ধরণের জমিতে বিভিন্ন জৈব-অজৈব ও আর্থসামাজিক কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটিই ফসল-দেশী ধানের চাষ করা হয় এবং হেক্টরপিছু মাত্র ১.০-১.৫ টন চাল পাওয়া যায়। অথচ বেশী জল জমে এমন নীচুজমি উদ্যানপালন-মাছচাষ-প্রাণীপালন-কৃষিবন এবং অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় বিকল্প মিশ্রচাষের জন্য আদর্শ। এভাবে চাষ করা হলে এইরকম কম উপযোগী জমি থেকে নিশ্চিতভাবে বেশী ফলন, আয় এবং কাজের সংস্থান বাড়বে এবং খাদ্য, পুষ্টি ও পরিবেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব। প্রাকৃতিক ফসল এবং প্রমুখ খাওয়ার অভ্যাস ও অন্যান্য সামাজিক কারণে পূর্বভারতে এই চাষপদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

জমি নির্বাচন:

সাধারণভাবে দেড় থেকে সাড়ে তিন ফুট এবং সর্বাধিক ৫ ফুট পর্যন্ত জল জমে অথচ বারবার হড়কা বান হয় না এমন মাঝারি গভীর থেকে গভীর ধানজমি নির্বাচন করতে হবে। দেখতে হবে, জমির মাটি যেন বেশী জল ধরে রাখার উপযোগী এঁটেল মাটি হয়। এভাবে চাষের জন্য পছন্দসই হল এক একর থেকে এক হেক্টর বা তারও বেশী মাপের আয়তাকার বা বর্গাকার চৌকো জমি।

জমির নকশা:

জমির নকশায় জমিকে বিভিন্ন স্তরে এবং আকারে ভাগ করতে হবে। উঁচুজমিতে প্রথম ও দ্বিতীয়-দুটি স্তরে থাকতে হবে ১৫ শতাংশ জমি। এর নীচে তৃতীয় স্তরে ৪০ শতাংশ বৃষ্টিনির্ভর এবং ৫০ সেমি জল জমতে পারে এমন নীচুজমিতে ধানচাষ করতে হবে। সবচেয়ে নীচে বাকী অর্ধেক ৫০ থেকে ১০০ সেমি গভীর নীচু জমি চতুর্থ স্তরে ধান চাষের জন্য বরাদ্দ থাকবে। উঁচুজমির জায়গা জুড়ে রাখা প্রথম স্তরে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ফলের বাগান করা যেতে পারে। বাকী আর্ধেক উচুজমিতে দ্বিতীয় স্তরের জমি থাকা দরকার। একে সমান দুভাগে ভাগ করে একভাগে কন্দফসল এবং অন্য ভাগে গোটা বছর ধরে সবজিচাষের জন্য রাখা হয়। প্রথম দুটি স্তরের মধ্যে মোটামুটি ০.৫ শতাংশ ঢাল রাখা হয়। একইভাবে তৃতীয় স্তরে বৃষ্টিনির্ভর নীচুজমি ও চতুর্থ স্তরে গভীর নীচু ধানজমির মধ্যে ১ শতাংশ ঢাল রাখতে হবে। এই জমিতে মোট ২৫ শতাংশ এলাকায় পুকুর (ছোট জলবিভজিকা) খুঁড়তে হবে। এর মধ্যে নীচের দিকে ১৮ শতাংশ জায়গা জুড়ে রাখতে হবে ৮ ফুট বা ২.৫ মি গভীর পুকুরে এবং ১৭ ফুট বা ৫ মিটার চওড়া "মুখের" মাধ্যমে ধানজমির সাথে বড় পুকুরের যোগ থাকে। এখানে বিভিন্ন ধরণের মাছ ও চিংড়ি চাষ করা যায়। এছাড়া উপরের প্রথম স্তরের পাশাপাশি বা সংলগ্ন এলাকার ৭ শতাংশ জায়গায় ৫ ফুট বা দুই মিটার গভীর করে ছোট একটা পুকুর খুঁড়তে হবে। এই পুকুরে মাছের চারাপোনা ও এক বছর বয়স পর্যন্ত মাছচাষ করা যাবে। বিভিন্ন স্তরে ফসলের ধরণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই দুটি পুকুরে জমা হওয়া বৃষ্টির জল দিয়ে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। গোটা এলাকা ঘিরে ২ মিটার চওড়া ও ১.৫ মিটার উঁচু বাঁধ দিতে হবে। এতে মোট ২০ শতাংশ জায়গা লাগবে। বাঁধের দুদিকে ভারী মাটিতে পাশাপাশি ১:১ অনুপাতে এবং হাল্কা মাটিতে এর চেয়ে বেশী অনুপাতে ঢাল রাখতে হবে। মাটির ক্ষয় কম করার জন্য পুকুর ও বাঁধের মধ্যে ১ মিটার চওড়া করে মাটি আঁটোসাঁটো করতে হবে ও নিবিড়ভাবে ঘাষ লাগাতে হবে। কৃষি-জলবায়ু এলাকা, মাটিতে জলের অবস্থা এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের এলাকা ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ অদল-বদল করা যেতে পারে। হাঁস-মুরগী পালনের জন্য পুকুরের বাঁধে এমনভাবে ঘর বানাতে হবে যাতে ঘরের অর্ধেকটা পুকুরের জলের উপর থাকে। এতে হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা ও না-খাওয়া খাবার, জৈবসার এবং মাছের খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খড় বা অ্যাসবেস্টসের ছাউনিওয়ালা বাঁশ বা তারজালি দিয়ে এই ঘরগুলি বানালে খরচ কম পড়ে। এভাবে এক হেক্টর এলাকা তৈরী করতে মোটামুটি ১,৩০,০০০/- টাকা এবং হাঁস-মুরগীর ঘরগুলি বানাতে প্রায় ২০,০০০/- টাকা খরচ পড়ে।

ফসল উৎপাদন পদ্ধতি:

এক হেক্টর বা ৭.৫ বিঘা এলাকার জন্য সমন্বিত চাষ পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল:

উচুজমি (প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর)

প্রথম স্তর (ফলের গাছ):

আম:

বর্ষায় ৩-৪ বার বৃষ্টি হওয়ার পরে সারি থেকে সারি এবং চারাগাছে মধ্যে ৫ মিটার দূরত্ব রেখে জোড়া কলম করা ১৫টি আমের চারা যেমন গোলাপখাস, আম্রপলি, মল্লিকা, দশেরী, বঙ্গনপল্লী ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। ফলের চাষ সঠিকভাবে করতে হলে সময়ে গাছের শাখা বিন্যাস ও ডাল ছাঁটাই, খড়, পাতা ইত্যাদি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দেওয়া, প্রয়োজনমত জৈব ও রাসায়নিক সার, সেচ প্রয়োগ এবং যথাযথভাবে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সুসংহত শস্যরক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে জৈব বা জীবাণুঘটিত কৃষিবিষ এবং উদ্ভিদখাদ্য প্রয়োগ করে ফসলের চাষ করা উচিত।

পেয়ারা:

বর্ষাকালে গুটি কলম বা জোড়া কলম করা এলাহাবাদ সফেদা, অর্ক অমুল্য, অর্ক মৃদুল, সফেদ জাম, সরদার ইত্যাদি উন্নত জাতের পেয়ারার ১৫টি চারা সারি থেকে সারি এবং চারাগাছের মধ্যে ৪-৫ মিটার করে দূরত্ব রেখে বসাতে হবে। নিয়মিত ডাল ছাঁটাই করে গাছের উচ্চতা কম করে রাখতে হবে। আমের মত এক্ষেত্রেও যথাসময়ে সমস্তধরণের পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

সফেদা:

বর্ষাকালে কালিপাত্তি, কো-১, কো-২, পি.কে.এম.-১, পি.কে.এম.-২ ইত্যাদি উন্নত জাতের সফেদার ৫ টি চারা সারি থেকে সারি এবং চারাগাছের মধ্যে

৫ মিটার করে দূরত্ব রেখে বসাতে হবে। আম ও পেয়ারার মত এক্ষেত্রেও যথাসময়ে সমস্তধরণের পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

পেঁপে:

প্রথম ২-৩ বছর বর্ষাকালে কুর্গ হানিডিউ, পুসা ডুয়ার্ফ, পুসা ম্যাজেস্টি, পুসা জায়েন্ট, পুসা নানহা, পুসা ডিলিশাস, কো-১, কো-২, ওয়াশিংটন ইত্যাদি উন্নত এবং বেটে জাতের পেঁপের ১০০টি চারা আম, পেয়ারা ও সফেদা চারার ফাঁকে ফাঁকে ১.৫-২ মিটার দূরত্ব রেখে বসাতে হবে। পেঁপে চাষের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে ভাইরাস-আক্রান্ত চারা থাকলে সেগুলি তুলে নিয়মিতভাবে সেখানে সুস্থ চারা বসাতে হবে।

কলা:

প্রথম কয়েক বছরে বর্ষার সময়, পাকা কলা ও কাঁচাকলা পাওয়ার জন্য উন্নত জাতের বা টিস্যু কালচার কলার ২৫টি চারা ২ মিটার দুরত্ব রেখে অন্যান্য ফলগাছের চারার ফাঁকে বসাতে হবে। জনপ্রিয় কলার জাতগুলি হল ডুয়ার্ফ ক্যাভেন্ডিস , রোবাস্টা, গ্রান্ড নাইন, রসথলি, মন্থন, পুবান ইত্যাদি। কলাচাষের জন্য যথাযথ কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

আনারস:

বর্ষাকালে আনারসের ৩০০ টি ভুমি বা কান্ড বা পার্শ্ব তেউর (গাছের গোড়া বা মাটি/কান্ড/পাশ থেকে বের হওয়া তেউর) দুইসারি বেড করে কোনাকুনি চারা থেকে চারা ৩০ সেমি. বা ১ ফুট, সারি থেকে সারি ৬০ সেমি বা ২ ফুট, বেড থেকে বেডের মধ্যে ৯০ সেমি বা ৩ ফুট দূরত্ব রেখে অন্যান্য ফলগাছের মাঝে ফাঁকা জায়গায় লাগাতে হবে। কুইন, কিউ ইত্যাদি জাতের আনরসের চারা আম, পেয়ারা ও সফেদা গাছের ছায়াতলের নীচে বসানো যেতে পারে। প্রয়োজনমত সার ও সেচ প্রয়োগ এবং রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

ওল:

প্রথম কয়েক বছরে পেঁপে গাছের মাঝে অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে গজেন্দ্র জাতের ১০০টি চারা লাগাতে হবে। পরবর্তী বছরগুলিতে পেয়ারা বাগানের অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে ওল লাগানো যেতে পারে। এছাড়া প্রথম দিকের বছরগুলিতে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেলে সেখানে আদা, হলুদ, বরবটি, ঢেরস, সীম, লঙ্কা ইত্যাদি সবজি লাগানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর:

কন্দ ফসল:

এই স্তরে বিভিন্ন কন্দ ফসল ফলানো যেতে পারে। যেমন সম্রাট, সৌরীন, কলিঙ্গ, কিষাণ, গৌরী, শঙ্কর, পুসা সফেদ, রাজেন্দ্র সকরকন্দ, বিধান জগন্নাথ বা নরেন্দ্র মালতী জাতের মিষ্টি আলু, গজেন্দ্র, পদ্মশ্রী অথিরা, বিধান কুসুম, এন.ডি.এ.-৫ জাতের ওল, মুক্তকেশী, শতমুখী, শ্রীপল্লবী, শ্রীরশ্মি, বিধান কুসুম বা বিধান জয়দেব জাতের কচু, ওড়িশা এলিট, হাতিখোজা, শ্রীশিল্প, শ্রীকার্তিক, কুঁয়ারী আলু বা ইন্দু জাতের খামালু। জমি তৈরী, চারা লাগানো, আগাছা দমন, গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া, প্রয়োজনে ঠেকা বা মাচা তৈরীর মত অন্তর্বর্তী পরিচর্যা করা, বিধিসম্মত জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, সেচ প্রয়োগ, যথাযথভাবে রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ ও সময়ে ফসল তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। জমির যে জায়গায় মিষ্টি আলু লাগানো হবে, সেখানে বিশেষ শস্যপর্যায় মেনে চাষ করতে হবে। যেমন, ঢেড়স (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)-মিষ্টি আলু (অক্টোবর / নভেম্বর-জানুয়ারী / ফেব্রুয়ারী)- বরবটি (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল)।

সবজি ফসল:

এই স্তরে জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত উচ্চফলনশীল জাতের বিভিন্ন সবজি বছরভর ফলানো যায়। বর্ষাকালে ঢেড়স, ঝিঙে, বরবটি, চিচিঙ্গা, লাউ

ইত্যাদি, শীতের সময় টমাটো, বীনস, মুলো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পাতাজাতীয় সবজি ইত্যাদি এবং মরসুমে লালশাক, বরবটি, করলা, কুমড়ো, শশা ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। বিধিবদ্ধ পদ্ধতি মেনে সবজি চাষ করতে হবে অর্থাৎ জমি তৈরী, বীজ বোনা, জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমন, গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া, রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণ করে সময়ে ফসল তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীচুজমি (তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর)

বর্ষা মরসুম

ধান:

বর্ষার সময় পছন্দসই গুণযুক্ত উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ করতে হবে। যেমন, মাঝারি লম্বা / লম্বা, দীর্ঘমেয়াদী, শক্তকান্ডওয়ালা, আলোকসংবেদী এবং রোগ-পোকা সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন জাত নিতে হবে।

তৃতীয় স্তর (বৃষ্টিনির্ভর নীচুজমি): সবিতা, গায়ত্রী, পুজা, সরলা, ভূদেব, গোলক, যোগেন, সুধা, মধুকর, বার আওয়ারোধি, রঞ্জিত, জলশ্রী ইত্যাদি জাত চাষ করা হবে।

চতুর্থ স্তর (মাঝারি গভীর / গভীর জলজমি): এই স্তরে বর্ষাধান, দুর্গা, হংসেশ্বরী, সরস্বতী, জলপ্রভা, জলপ্রিয়া ইত্যাদি জাতের ধানচাষ করা যেতে পারে।

শুষ্ক মরসুম

তৃতীয় স্তর (বৃষ্টিনির্ভর নীচুজমি): অগে থেকে ধরে রাখা বৃষ্টির জলে সেচ দিয়ে ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন, মিষ্টি আলু, তরমুজ, মুগ, বাদাম, সূর্যমুখী, সবজি ইত্যাদি ফলানো সম্ভব। এখানে ধানচাষ করার পরে যেমন বিনা চাষ দিয়ে মিষ্টি আলু লাগানো যেতে পারে। এতে দুটি সুবিধা পাওয়া যায় যেমন, দুটি সেচ বাঁচানো যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের দু'সপ্তাহ আগেই ফলন পাওয়া সম্ভব।

চতুর্থ স্তর (গভীর জলাজমি): এই স্তরে অর্ধেক এলাকায় গভীর জলের ধানের পর বা আগে থেকে ধরে রাখা বৃষ্টির জল ব্যবহার করে নবীন, শতাব্দী, ললাট ইত্যাদি জাতের উচ্চফলনশীল বোরোধান চাষ করতে হবে। বাকী জায়গায় ঢেড়সের মত সবজি চাষ করা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা:

আমন ধান:

১. বর্ষার বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই লাঙল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে।

২. জমি তৈরীর সময় বা বোনার সময় হেক্টর পিছু ৫ টন জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।

৩. মৌসুমী বৃষ্টি শুরুর আগে জমিতে হেক্টর পিছু ৫০-৬০ কেজি ভালোমানের বীজ সারি করে বোনা ভালো। সারি থেকে সারিতে ৮ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারাতে ৫ ইঞ্চি দূরত্ব রেখে ৩-৫ টা করে বুনলে সুবিধাজনক হবে।

৪. ৪০ দিন বয়সী সুস্থ চারা দ্রুত রোয়া করতে হবে।

৫. তৃতীয় স্তরে নীচুজমির ধান চাষ করতে হলে বীজ বোনার সময়েই হেক্টর পিছু ৫০:২৫:২৫ কেজি হারে নাইট্রোজেন: ফসফরাস: পটাশ হিসাবে প্রয়োজনীয় সার দিতে হবে।
চতুর্থ স্তরে গভীর জলের ধান চাষের জন্য হেক্টরপিছু ৪০:২০:২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন: ফসফরাস: পটাশ হিসাবে প্রয়োজনীয় সার দেওয়া প্রয়োজন।

৬. আগাছা পরিস্কারের জন্য জমিতে জল না থাকা অবস্থায় ফিঙ্গার উইডার বা ৫-১০ সেমি. জল থাকলে কোনো উইডার ব্যবহার করতে হবে। ফাঁকা জায়গাগুলো নতুন চারা লাগিয়ে ভরাট করতে হবে।

৭. রাসায়নিক কীটনাশক বা আগাছানাশক প্রয়োগ করা যাবে না। ধানজমিতে হলুদ মাজরাসহ অন্যান্য পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য হেক্টরপিছু ২০টি ফেরোমোন ফাঁদ এবং পুকুরের জলের উপরে ৩-৪ জায়গায় ইলেকট্রিক বাল্ব বা কেরোসিনের আলো জালিয়ে আলোকফাঁদের ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের গোটা মরসুমে ১-২ বার ফেরোমোন ফাঁদের রাসায়নিক বদল করে নতুন দিতে হবে। এছাড়া কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য ১ শতাংশ হারে উদ্ভিজ্জ কীটনাশক নেথ্রিন বা নিম্বেসিডিন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বোরো ধান:

১. প্রথম ও শেষবার জমি চাষের মধ্যে ৭-৮ দিন ফাঁক রেখে দুবার জমি চাষ করতে হবে এবং মই দিয়ে মাটি সমান করতে হবে।

২. জমি তৈরীর সময় হেক্টারপিছু ৫ টন জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে।

৩. জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে সারি থেকে সারিতে ৫ ইঞ্চি এবং চারা থেকে চারাতে ৪ ইঞ্চি দূরত্ব রেখে ২০-২৫ দিনের চারা রোয়া করতে হবে। রোয়ার এক সপ্তাহ পরে নতুন চারা দিয়ে প্রয়োজনে ফাঁক ভরাট করতে হবে।

৪. বোরোধান চাষের জন্য হেক্টারপিছু মোট ১২০:৬০:৬০ কেজি হারে নাইট্রোজেন: ফসফরাস: পটাশ হিসাবে সার প্রয়োজন। মুলসার হিসাবে প্রয়োজনীয় সারের অর্ধেক নাইট্রোজেনঘটিত সার, পুরো ফসফেট সার এবং ১৫ শতাংশ পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। রোয়ার ১০-১৫ দিন পরেও এই অর্ধেক নাইট্রোজেনঘটিত সার দেওয়া চলে। বাকী অর্ধেক দুটি সমান ভাগে ৩ সপ্তাহ পরে এবং থোড় আসার সময় জমিতে দিতে হবে। এছাড়া বাকী সিকিভাগ পটাশ সার থোড় আসার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

৫. বোয়ার বিকল্প হিসাবে কাদান-করা জমিতে ড্রাম সীডারের মাধ্যমে হেক্টর-পিছু ৪০ কেজি কল-বেরোনো ধানবীজ বোনা যেতে পারে। এতে শ্রমিকের খরচ কমে।

৬. রাসায়য়িনক কীটনাশক বা আগাছানাশক প্রয়োগ না করাই ভালো। ধান জমিতে হলুদ মাজরাসহ অন্যান্য পোকা নিয়ত্রণের জন্য ফোরোমোন ফাঁদ ও আলোকফাঁদের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য ১ শতাংশ হারে উদ্ভিজ্জ কীটনাশক নেথ্রিন বা নিস্বেসিডিন প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোয়ার আগে সারারাত ধরে ০.০২ শতাংশ হারে ক্লোরোপাইরিফস বা ০.০১ শতাংশ হারে ইমিডাক্লোপ্রিডে চারার শিকড় ডুবিয়ে রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বর্ষায় ধানজমি-পুকুর পরিবেশে মাছ এবং চিংড়ি চাষ:

মাছচাষ: এখানে কাতলা, রুই, মৃগেল মাছচাষ করা যাবে। অন্যান্য প্রজাতির মাছ যেমন, সিলভার কার্প, সাধারণ কার্প এবং সিলভার বার্ব (পুনটিয়াস গোনিয়োনোটাস) এই জায়গায় চাষ করা যায়। এতে বিশেষত: শেষ দুটি প্রজাতির মাছচাষের মাধ্যমে ধানজমিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা আছে।

চিংড়িচাষ: মাছের সঙ্গে মিষ্টিজলের বড় চিংড়ি (ম্যাক্রোব্র্যাকিয়াম রোসেনবার্গি) চাষ করা যায়। বর্ষায় জল জমে থাকা ধানজমি ও পাশের পুকুরে মাছের ছোট চারাপোনা ও চিংড়ি একসাথে চাষ করতে হবে। ধান কেটে নেওয়ার পরে পুকুরে এদের পালন ও বড় করা যাবে।

ব্যবস্থাপনা:

১. ৩-৪ ইঞ্চি মাপের মাছের চারাপোনা এবং ২-৩ ইঞ্চি মাপের ছোট চিংড়ি ১:৩ অনুপাতে এক হেক্টর জলাএলাকায় ৭০০০ টি হিসাবে ছাড়তে হবে।

২. ৩০ শতাংশ মাছ জলের উপরে স্তর থেকে খাবার নেয়, যেমন- কাতলা, ২০ শতাংশ মাঝামাঝি থেকে খায়, যেমন- রুই এবং ৫০ শতাংশ নীচের স্তর থেকে খায়, যেমন- মৃগেল ও চিংড়ি-এই হিসাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এখানে ছাড়তে হবে। চিংড়ির মীন না পাওয়া গেলে এখানে জলের উপরের স্তর থেকে খাবার নেওয়া প্রজাতি, যেমন-কাতলা ও সিলভার কার্প, মাঝামাঝি থেকে নেয়, যেমন- রুই, সিলভার বার্ব এবং নীচের স্তর থেকে খায়, যেমন- মৃগেল ও সাধারণ কার্প, ৩৫:৩৫:৩০ অনুপাতে ছাড়া যেতে পারে।

৩. হেক্টরপিছু মোট ৫-১০ টন গোবর এবং ২০০-৫০০ কেজি চুন মাসে মাসে ভাগ করে জলে দিতে হবে।

৪. মাছ ও চিংড়ির মোট ওজনের ২ শতাংশ হারে প্রতিদিন খাবার দিতে হবে। এই খাবারের মধ্যে ৯৫ শতাংশ ১:১ অনুপাতে খোল ও ধানের তুষ এবং বাকি ৫ শতাংশ মাছের ফিসমিল মিশিয়ে জলে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

৫. চিংড়ির সময় প্রয়োজনীয় আশ্রয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য মাটির পাইপ, ডালপালার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. নিয়মিত জাল ফেলে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার। মাছের মারণ রোগ এপিজুটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতি হেক্টর পিছু জলে ১ লিটার সিফাক্স প্রয়োগ করতে হবে। বিকল্প উপায় হিসাবে প্রথম অবস্থায় হেক্টার পিছু মোট ২০০ কেজি চুন প্রয়োগ করলে এই রোগের সংক্রমণ রুখতে কার্যকরী হয়।

৭. মাছ ও চিংড়ি বড়মাপের হলে পুকুর থেকে মাঝে মাঝে তুলে নিতে হবে।

মাছের চারাপোনার চাষ:

নির্ধারিত জমির উপরের অংশে খোঁড়া ছোট পুকুরে কাতলা, রুই ও মৃগেলের চারাপোনা তৈরী করা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপন:

১. মাছের ডিমপোনা ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে হেক্টার পিছু ৩-৪ টন গোবর প্রয়োগ করতে হবে। এর পরে ১৫ দিন অন্তর ০.৫ টন করে গোবর দিতে হবে। এছাড়া জলজ ঝাঁঝিপানা যাতে ভালোভাবে বেড়ে উঠে সেইজন্য হেক্টার পিছু ১০ কেজি ইউরিয়া এবং ১৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে।

২. ২.৫ সেমি. বা ১ ইঞ্চি মাপের কাতলা, রুই এবং মৃগেল মাছের ভালোমানের ডিমপোনা ৩৫:৩৫:৩০ শতাংশ হিসাবে প্রতি হেক্টর জলের এলাকাপিছু ২-৩ লাখ হারে ছাড়তে হবে।

৩. ডিমপোনার খাবার হিসাবে ধানের তুষ ও বাদামের খোল ১:১ অনুপাতে মিশিয়ে প্রতিদিন দিতে হবে। প্রথম মাসে জলে থাকা মাছের মোট ওজনের ৮-১০ শতাংশ, দ্বিতীয় মাসে ৬-৮ শতাংশ এবং তৃতীয় মাসে ৪-৬ শতাংশ পরিমাণে খাবার দিতে হবে।

৪. তিনমাস লালন করার পর মাঝে মাঝে জাল ফেলে ৮-১০ গ্রাম ওজনের ও ৮-১০ সেমি মাপের চারাপোনা তুলে নিতে হবে।

৫. প্রয়োজনমত চারাপোনা পাশের পুকুরে ছেড়ে দিয়ে বাকীটা বিক্রি করে দিতে হবে।

৬. বছরখানেক বাদে বা বাজারে বিক্রির মতো বড়মাপের হওয়া পর্যন্ত এই মাছ লালন-পালন করতে হবে, যথাসময়ে বিক্রি করে ভালো লাভ পাওয়া যাবে।

বাঁধের উপর চাষ পরিকল্পনা:

ফলগাছ : এখানে ১৫০ টি উন্নতজাতের পেঁপে ও ৫০ টি পাকাকলা এবং কাঁচাকলার তেউড় বসাতে হবে।

বগিচা ফসল : পুকুরের ধারে ২০ টি লম্বা এবং বেঁটে প্রজাতির নারকেল এবং ২০ টি সুপারি গাছ বসাতে হবে। এগুলি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিতে হবে যেমন, জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, সেচ, পাতা ছাঁটাই এবং রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ।

ফুলচাষ : এখানে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের চাষ করা যেতে পারে।

মৌমাছি পালন : জমির উপরের স্তরে এবং বাঁধে ৩-৪ টি মৌবাক্স রেখে মৌমাছি পালন করা যেতে পারে এবং নিয়মিতভাবে মধু বের করে নিতে হবে।

মাঁচায় চাষ : লতানো সবজি যেমন চিচিঙ্গা, করলা, ঝিঙে, লাউ, চালকুমড়ো ইত্যাদি পুকুরের জলের উপর বাঁশ বা অন্যান্য কমদামী জিনিস দিয়ে মাঁচা বেঁধে বছরভর চাষ করা যায়।

হাঁস পালন : খাঁকি ক্যাম্পবেল বা অন্যান্য উন্নত প্রজাতির ৫০-১০০ টি হাঁস এখানে পালন করতে হবে। ধানের ফুল আসার আগে পর্যন্ত এরা ধানের মাঠে চরতে পারে। এরপর পুকুরের পাশে ঘর বানিয়ে এদের রাখতে হবে।

মুরগীপালন : ডিম ও মাংস, দুটোই পাওয়ার জন্য বনরাজা, গ্রামপ্রিয়া, স্বর্ণধারা, কারি দেবেন্দ্র এবং উপকারি প্রজাতির ৭৫-১০০ টি রঙীন মুরগী খাঁচার মধ্যে রেখে পালন করতে হবে। প্রজাতিভেদে মুরগীর জীবনকাল ৭৫-৯০ দিন ধরলে বছরে চারদফায় মুরগীপালন করা যাবে।